সিন্ডিক্যালিজমের শীর্ষ 10টি নীতি - ব্যাখ্যা করা হয়েছে!

নিম্নলিখিত 10টি সিন্ডিক্যালিজমের নীতি রয়েছে:

(1) পুঁজিবাদের নিন্দা:

অন্যান্য সমাজতন্ত্র এবং মার্কসের মতো, সিন্ডিকালিস্টরাও পুঁজিবাদের তীব্র নিন্দা করে। তারা বলেন, পুঁজিবাদের মাধ্যমে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয় এবং দেশের সম্পদ গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।

(2) শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতা:

অন্যান্য সমাজতন্ত্রী এবং মার্কসদের মতো সিন্ডিকালিস্টরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবী দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে, অর্থাত্ পুঁজিবাদী এবং শ্রমিকশ্রেণী। তাদের স্বার্থ সাংঘর্ষিক, এক শ্রেণি শোষক আর অন্য শ্রেণি শোষিত। শ্রমিকদের ক্রমাগত শোষণ করে পুঁজিপতিরা কোটিপতি হয়ে যায়।

অতএব, উভয়ের স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য এবং তারা একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারে না। সেজন্য সিন্ডিকালিস্টরা পুঁজিপতিদের কাছে কোনো সংস্কার দাবি করে না, বরং তিক্ত সংগ্রামের পর পুঁজিবাদকে বিলুপ্ত করতে চায়।

(3) রাষ্ট্রের সমাপ্তি:

সিন্ডিকালিস্টরা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি চায়; কারণ রাষ্ট্র সবসময় পুঁজিপতিদের সমর্থন করে এবং পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করেনি।

(৪) মধ্যবিত্তের বিরোধিতা:

কমিউনিস্টদের মতো সিন্ডিকালিস্টরা মধ্যবিত্তের সমালোচনা করেছে কারণ মধ্যবিত্তরা সাধারণত পুঁজিপতিদের পক্ষ নেয়। সর্বাধিক তারা সংস্কারবাদী হতে পারে কিন্তু সমাজতন্ত্রী নয়। কিছু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সিন্ডিকালিজমকে সমর্থন করে। কিন্তু তারা নেতা হওয়ার জন্য এটা করে, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায় বলে নয়।

(5) জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস নেই:

মার্কস বলেছিলেন যে প্রলেতারিয়েতদের কোন পিতৃভূমি নেই। তিনি তাঁর দর্শনে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের কোনো স্থান দেননি। সিন্ডিকালিস্টরাও মার্ক্সের এই তত্ত্বের সাথে একমত।

(৬) গণতন্ত্র ও সংসদীয় সরকারের প্রতি আস্থা নেই:

সিন্ডিকেলিস্টরা বলছেন, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র ও সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকদের অবস্থার কোনো পার্থক্য হয়নি। তারা মনে করেন, গণতন্ত্রে পুঁজিবাদের প্রভাব আগের মতোই রয়েছে এবং শ্রমিকদের অবস্থা এখনও উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। গণতন্ত্রের আবির্ভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শ্রমিকরা শোষিত হচ্ছে ক্রমাগত।

(7) সেনাবাহিনী এবং যুদ্ধের প্রতি মনোভাব:

সিন্ডিকালিস্টরা মনে করেন, যুদ্ধের মূল কারণ বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে সংঘর্ষ। তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের স্বার্থ সব দেশেই সমান। তাই তারা অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না।

পুঁজিবাদীরা তাদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য ও দেশপ্রেমের জন্য যুদ্ধকে উৎসাহিত করে। তাই বিশ্বের শ্রমিকদের এ ধরনের যুদ্ধ নিয়ে কোনো চিন্তা না করে নিজেদের সরকারের বিরোধিতা করা উচিত। মার্কস এবং লেনিন তাদের জীবদ্দশায় এটি করেছিলেন। তাই সিন্ডিকালিস্টরাও এর ওপর বিশেষ জোর দেয়। সেনাবাহিনী সম্পর্কে, তারা বলে যে এটি প্রয়োজনীয় নয় কারণ এটি পুঁজিবাদীদের যুদ্ধের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং এটি শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

(৮) সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা :

মার্কস বিপ্লবের পর সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু সিন্ডিকালিস্টদের তাতে বিশ্বাস নেই। তারা মনে করে যে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রথমে একটি দলের একনায়কত্বে পরিণত হয় এবং পরে তা এক নেতার একনায়কত্বে পরিণত হয়।

তারা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের তিক্ত সমালোচনাও করে কারণ উৎপাদনে সরকারী কর্মকর্তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মনোভাব পদ্ধতিতে সহায়ক হয় না। সিন্ডিকালিস্টরা উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে শ্রমিক ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ চায়।

(9) বিপ্লবের পর সমাজের ভবিষ্যৎ থাপ্পড়:

অধিকাংশ সিন্ডিকালিস্ট রাষ্ট্র বিলুপ্তির পর সমাজের প্রস্তাবিত ভবিষ্যত গঠন সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেননি। তারা বলেন, সবার আগে বিপ্লব ঘটাতে হবে। এর পরে সামাজিক সেট আপ কী সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে প্রশ্ন। তবে কিছু সিন্ডিকালিস্ট এ বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, বিপ্লবের পর আর সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হবে না। বিভিন্ন সিন্ডিকেটের নিজস্ব মিলিশিয়া থাকবে, যারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকবে এবং প্রয়োজনে তাদের অনেক বিস্তৃত এলাকায় ব্যবহার করা হবে।

এইভাবে, তারা নৈরাজ্যবাদীদের থেকে পৃথক, যারা বিপ্লবের পরে কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ করতে চায় না। সিন্ডিকালিস্টদের মতে, দেশব্যাপী ইউটিলিটি সার্ভিস যেমন রেলওয়ে, পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ ইত্যাদি শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন হবে। অন্যান্য পরিষেবাগুলিও বিভিন্ন শ্রম সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

(10) নির্বাচন এবং রাজনৈতিক দলগুলির উপযোগিতার উপর অনাস্থা:

নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাজে সিন্ডিকালিস্টদের কোনো আস্থা নেই। তারা বলছেন, নির্বাচনে পুঁজিপতিরা লাখ লাখ টাকা খরচ করে এবং প্রেসকে ঘুষ দেয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জেতা কর্মীদের পক্ষে কঠিন। এমনকি কিছু শ্রমিক নির্বাচনে জয়ী হলেও সংসদে তারা বেশি কিছু বলার মতো অবস্থায় থাকবে না, কারণ সেখানে পুঁজিপতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে।